

সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’: অতীতের বিনির্মাণ
শর্মিষ্ঠা আচার্য

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/17_Sharmistha-Acharya.pdf

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যের সৃষ্টি বা বিনির্মাণ একজন লেখকের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অতীতের পর্যালোচনা অথবা অতীতের প্রেক্ষাপটে নতুন পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, মূল্যবোধ বা মূল্যবোধের পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভবত সাহিত্যের মানকে কেবল উৎকৃষ্টই করে না, বরং পাঠককেও নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। বিনির্মাণের মাধ্যমে, বর্তমানের সঙ্গে একটি সমান্তরাল রৈখিক সূত্র তৈরি করা হয়, সেখানে লেখার অর্থের বহুমাত্রিকতা সন্নিবেশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী বা তারও আগে, মানুষের চিন্তাভাবনা এবং চেতনায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল, কিন্তু মানুষ পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের শিকার হয়েছিল; ফলে মানুষের চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। সেই অর্থে বিংশ শতাব্দী হলো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চারণভূমি। ফরাসি দার্শনিক জ্যাক দেরিদা ছিলেন এর অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। তাঁর মন এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ উত্তর-আধুনিক দর্শনকে ভিন্ন অর্থে প্রসারিত করেছে। আজও, সাহিত্যের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এই বিশ্লেষণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ড. তপোধীর ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের একজন বিশিষ্ট আলোচক এবং প্রবক্তা। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে লেখিকা সেলিনা হোসেনের বহুল আলোচিত উপন্যাস ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, এখানে আছে একটি জাতির শিকড়ের সন্ধান। কেবল মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নই নয়, পুরনো মূল্যবোধগুলিতে বর্তমানের প্রতিস্থাপনও প্রতিফলিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: নির্মাণ, বিনির্মাণ, সমসাময়িক, প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ, প্রতীকী, সমান্তরাল, রৈখিক, প্রতিফলন।

বিংশ ও একুশ শতকের যে সকল সাহিত্যিক পুরাণের মিথকে সমসাময়িককালের সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আজিকে পরিবেশন করে চলেছেন, নতুন সৃষ্টির দৃষ্টান্ত তৈরি করছেন, সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁদেরই অন্যতম। লেখিকার জন্ম ১৯৪৭এর ১৪ জুন নোয়াখালির লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। সারা পৃথিবী তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাস্পে কবলিত। তাঁর জন্মের ঠিক দু’বছর আগে ১৯৪৫এর ৬ ও ৯ অগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলাফল স্বরূপ তাৎক্ষণিক আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষ নিহত হয় ও অগণিত মানুষ পঞ্জাভূতের শিকার হয়। ভারতবর্ষে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ ভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪৩এর এই মঘস্তর ‘পঞ্চাশের মঘস্তর’ নামে পরিচিত। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান ভাগ হয়ে যায়। ভারতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। অন্যদিকে ১৯৫২ সালে পূর্বপাকিস্তানে উর্দুর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীতে ভাষা আন্দোলন ঘটে। লেখিকার জন্মস্থান রাজশাহী তখন তেভাগা আন্দোলনে উত্তপ্ত। জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল পরিবেশে একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠেন তিনি। ফলাফলস্বরূপ শৈশবের পারিপার্শ্বিক ঘটনার আঁচ তাঁকে স্পর্শ করেছিল অচিরেই। অবচেতনই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এক সংবেদনশীল মানবিক চেতনা। তাঁর স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ (১৯৬৯)এই নামকরণের মধ্যে এক দ্যোতনা আছে। তিনি মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে কখনো সরে যাননি।

একুশ শতকের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে সেলিনা হোসেন রচনা করেন ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮২)। উপন্যাসের পটভূমি হাজার বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের প্রাচীন কাল ও সমাজ ইতিহাস।

আলোচ্য উপন্যাসে শুধু দুটি ভিন্ন সময় উপন্যাসের পটভূমিতে স্থান পায়নি, পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে হাজার বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের প্রাচীন কাল ও সমাজ ইতিহাস। লেখিকা শুধু সমাজজীবন ও যুগকেই চিহ্নিত করেননি; বরং অতীতের ভিত্তিভূমির উপর সমসাময়িক কালকে সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত করেছেন।

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ পরিবেশের স্বাস্রোধ করা আবহ এবং সেই নেতিবাচকতা থেকে উত্তরণের ইজ্জিত। তাঁর লেখায় যেমন একদিকে জায়গা করে নিয়েছে মূল্যবোধের অভাবে হীনমন্যতা ও বুঢ়িহীনতায় ভোগা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অন্যদিকে বাঙালি জাতির অস্তিত্বের অনুসন্ধানের প্রয়াস। সেই সূত্র ধরেই মিথ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়ের কাছে তিনি পৌঁছে দেন পাঠক সমাজকে। বর্তমানের দর্পনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন অতীতকে। আসলে যেকোনো ঐতিহ্যশ্রিত ঘটনাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে পরেও অপরিবর্তিতই থেকে যায়। পার্থক্য ঘটে যখন লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা চেতনার রসে জড়িত করে সেই পুরাতনকে নব কলেবরে পাঠকের কাছে উপহার দেন। এখানেই সৃষ্টি হয় বিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশনের।

বিনির্মাণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নতুন সম্ভাবনার ইজ্জিত। পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে নানা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উঠে আসে এই বিনির্মাণের ধারণা; যা পরবর্তী কালে আরো স্পষ্ট হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জ্যাক দেরিদারের বিনির্মাণের সূত্রে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে হিপোলাইত তেইন তাঁর ‘History of English Literature’ (১৮৬৩) গ্রন্থে সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সাহিত্যের বিশ্লেষণে সমকালের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালে মিশেল ফুকো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্যের বিচারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি পাঠককে — “নতুন দর্শন ও মূল্যবোধে উৎসাহী হতে বললেন। এই নতুন অভিজ্ঞতা অনুভব পাঠককে নতুন কিছু সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে।” ১৯৬৭ সালে জ্যাক দেরিদার তাঁর বিনির্মাণবাদ ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন — ‘Of Grammatology’ (১৯৬৭), ‘Writing and Difference’ (১৯৬৭), ‘Speech and Phenomenon and other Essays on Husserl’s theory of Sign’s’ (১৯৬৭)। সাহিত্য সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য ‘সাহিত্যের পুনর্নির্মাণঃপ্রাগাধুনিক বনাম আধুনিক’ গ্রন্থে আলোচনা করে দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও তাত্ত্বিকরা বিনির্মাণতত্ত্বকে কীভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সাহিত্যের এই বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপ ও আমেরিকায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

অপরদিকে বিনির্মাণবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছে। পাশ্চাত্য সমালোচক জন সার্ল এই মতকে অস্পষ্ট বলে মনে করেছেন। কিন্তু গঠনবাদী তাত্ত্বিকেরা বিনির্মাণবাদ বা ডিকনস্ট্রাকশনকে সমর্থন করেছেন। ড. তপোধীর ভট্টাচার্য বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — আপাতদৃষ্টিতে যাকে উদ্ভট মনে হয়, তারই সীমান্ত ছুঁয়ে যেন পাঠকৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়া কালান্তরের বার্তা নিয়ে এসেছে। জীবন যেহেতু পূর্বধারণ্য উপসংহার অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় না কখনো বিনির্মাণ সমস্ত অনন্বয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। যা-কিছু আবরণের আড়ালে, তাদের অনাবৃত করতে চায় বলে ভাষা, অভিজ্ঞতা বা মানবিক সংযোগের সমস্ত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে সংশয়বিশ্ব করে বিনির্মাণের কাজ শুরু হয়। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ্য হয়ে ওঠে। বিনির্মাণ মানবিক চিন্তা ও মননের এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে রৈখিক ধারাবাহিকতায় প্রয়োগ করা যায় না। যায় না কারণ, কোনো ধরনের অভ্যস্ততা বিনির্মাণপন্থায় অসম্ভব; তেমন সম্ভাবনা (বা আশঙ্কা) দেখা দিলে নিজেরই বিরুদ্ধে শুরু হতে চায় তার দ্রোহ। স্বভাবত সমালোচকদের মধ্যে বিনির্মাণের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ একে বিদ্যাচর্চার জগতে ক্ষণিকের ফানুস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কেউবা একে জ্ঞানের গভীর জগতে অনাবশ্যক উৎপাত বলে নিন্দা করেছেন। সন্ত্রাসবাদীরা যেমন অকারণ হিংস্রতায় সমাজের চলমান ধারায় ধ্বংসের আবর্ত তৈরি করে,

তেমনি বিনির্মাণপন্থাও সাহিত্যিক ভাবনার সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে নৈরাজ্য কায়ম করতে চায়। এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। কেননা, সাহিত্য সমালোচনার চিরাগত মূল্য-কাঠামো এবং ভাবকল্পকে সক্রিয়ভাবে আঘাত করেছে যে ‘কালাপাহাড়ি’ প্রবণতা, তার সম্পর্কে স্বস্তি বোধ না করারই কথা। ভাষাকে, চেতনাকে, আকরণকে আক্রমণ করে আসলে তাদের যে বাঁচাতে চাইছে। বিনির্মাণবাদ অবসাদের কৃষ্ণবিবর থেকে উৎপন্ন, এই উপলব্ধি খুব কম লোকের হয়েছিল। এর কারণ যদি খুঁজি, দেখব, সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে বহু তর্ক, কলহ ও মতের অমিল থাকলেও কিছু কিছু যথাপ্রাপ্ত বিধি ও চিন্তার আকরণ সম্পর্কে অনুচ্চারিত মতানৈক্যও ছিল। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিকোণগত যত বৈষম্যই থাক, এ ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন। (কিংবাতর্কাতীত বলে এ নিয়ে কথা বলারও তেমন কোনো তাগিদ বোধ করেননি) যে, সাহিত্যিক পাঠকৃতি মাত্রই তাৎপর্যগর্ভ এবং সাহিত্য সমালোচনার কাজ হলো ওই তাৎপর্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে তোলা। কিন্তু বিনির্মাণ যখন ‘সাহিত্য এবং সমালোচনা’ নামক দুটি চিরাগত বর্গের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষ্মণের রেখাটিকে প্রত্যাহ্বান জানাল, বোম্বার হতচকিত হয়ে পড়লেন।

সমালোচনা বিশেষ ধরনের জ্ঞান এবং তা সাহিত্যিক পাঠকৃতির সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা দেখায় না কখনো — সহজবোধ্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে এই বস্তু্য বিনা প্রশ্নে গৃহীত হয়ে এসেছে। কিন্তু বিনির্মাণবাদীদের কাছে সমালোচকের সন্দর্ভ কখনো জল-অচল নয়; বরং তা দার্শনিক প্রতিবেদনের মতো নানা বিশিষ্ট লিখন-প্রক্রিয়া অর্থাৎ সাহিত্যিকের পাঠকৃতি নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সৃষ্টি বলে উচ্চবর্গ সন্দর্ভ হিসেবে একমাত্র বন্দনীয়, এমন নয়। সমালোচকের প্রতিবেদনও সমানভাবে মাননীয় টেক্সট (পাঠকৃতি), কঠোর নিয়মবিন্যাস আর নিয়ত চলিত্বতার মধ্যে যা আশ্চর্য সেতু গড়ে দিতে পারে।^১ ডক্টর প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের মতে — “‘বিনির্মাণ’ পদ্ধতিতে Centre বা কেন্দ্র বিভাজিত হয় নানাভাবে। পঁয়াজের খোসার মতো তা খুলে খুলে বিস্তৃত হয়। পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাত্রাকালে তার রূপরীতির পরিবর্তন ঘটে। ফলে তা হয়ে ওঠে বহুস্বরের আকর। পুনর্নির্মাণের মধ্যে তার একটি নিজস্ব রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়।”^২

সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককে আগে পৌঁছতে হয় অতীতের শিকড়ের কাছে। অতীতকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হয়। কারণ, অতীতের ভিত্তির উপরই নির্মিত হয় নতুনের সৌধ। এই বিষয়ে সেলিনা হোসেনের নিজস্ব মতামত — “সাহিত্য একজন মানুষের আত্ম-আবিষ্কার, সেজন্যই পাঠক তাঁর কাছে যাবেন। সাহিত্য ব্যক্তির দর্পণ — সেখানে তিনি নিজেকে দেখতে পান সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়। সেজন্যই যাবেন। পাঠক যাবেন তাঁর প্রয়োজনে, তাঁর অন্তরের টানে। আমার গল্প উপন্যাসের কাছে কেন যাবেন? ভাবার বিষয়। এ পর্যন্ত ধ্রুপদী কিছু তৈরি করেছি এ ধরনের প্রত্যাশার ধৃষ্টতা নেই। আদৌ কিছু হয় কিনা সে বিচারও সময় করবে। শুধু এটুকু বলতে পারি যে নিজের মাটি এবং ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে দেশীয় চেতনায় আত্মস্থ করি বলেই পাঠক আমার রচনার কাছে আসবেন।”^৩ একটা ছোট্ট ভূখণ্ডই শুধু প্রয়োজন ছিল পরাধীন দেশবাসীর কাছে, সেখানে চারিদিক সবুজ, শস্য-শ্যামল হয়ে থাকবে। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো রক্তে প্রবাহিত হবে। এর চেয়ে বেশি চাওয়া ছিল না পরাধীন দেশবাসীর কাছে। কিন্তু সেখানেও রাষ্ট্র শক্তির চোখ রাঙানির সামনে পদে পদে হেনস্তা, লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হলো ১৯৫২র বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির আত্ম-উন্মোচন ঘটে। সেলিনা হোসেনের লেখায় মাতৃভাষার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার প্রতিফলন লক্ষিত। লেখিকা সেই অভিশপ্ত সময়কে মিলিয়ে দিলেন হাজার বছরের ফেলে আসা অতীতের সঙ্গে। বর্তমানের জীবন, সমাজ বিন্যাস, ক্ষমতাবানের দোঁর্দণ্ড প্রতাপ, দুর্বলের অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা — এইসবই ভাষা খুঁজে পেয়েছে প্রাচীন চর্যার জীবন চিত্রের নব রূপায়নে।

উপন্যাসে আমরা দেখি কাহুপা স্বভাবে কবি হলেও সে রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে। দরবারে রাজা উপস্থিত না থাকলেও সেই কাজ তাঁকে নিরলস ভাবে করে যেতে হয়। পাখা টানতে টানতে হাত যখন

অবস হয়ে আসে তখন তাঁর মনের মধ্যে পংক্তি গুনগুনিয়ে ওঠে। এই পংক্তিতে কখনো থাকে ভালোবাসার কথা, কখনো থাকে প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু প্রতিবাদ তো সরাসরি করা সম্ভব নয়, তাই কবিতার আবরণ পড়িয়ে দিতে হয় প্রতিবাদের ভাষার শরীরে। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে সংস্কৃতের জয়জয়কার সেখানে। সেখানে কবির বাংলায় কবিতা পাঠের অধিকার নেই কোনো। তাই — “ব্রাহ্মণ্যবাদের এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। অলি ঐ কলি ঐ বাট রুখেলা। তা দেখি কাহ্ন বিমনা ভইলা।”^৫ পাখা টানতে টানতে কাহ্নপাদ কেবলি নিজেকে প্রকাশের পথ খোঁজে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ জ্বালা গনগনে হাপরের মুখ খুলে রাখে, ও অমবরত পোড়ে। কোথায় গিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। অথচ কাহ্নপা চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত ভাষার স্থানে রাজদরবারে ভাষা হবে বাংলা।

অন্যদিকে ভুসুকুপা জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসেও তাঁর বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, নদী সব নরকের মতো মনে হতে লাগে। তাই তিনি আবার ঘর ছেড়ে চলে যেতে চান। তখন কাহ্নপা তাঁকে আটকাতে চান, আর বলেন — ‘কেন যাবে? আমরা রয়েছি না? এই মাটি, নদী আমরা সবাই তোমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবো ভুসুকু।’ জীবনের বিনিময়ে ভুসুকু আর কাহ্ন’র জীবন পুড়ে খাটি সোনা হয়ে গেছে। সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভুসুকুকের কথায় — ‘আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।’^৬ অন্যদিকে দেবল ভদ্রের অত্যাচারে মৃত প্রায় কাছ পাদ। অপরাধ, কাছ চেয়েছিলেন রাজদরবারে ভাষা হোক বাংলা ভাষা। ফলে তাঁর হাতের আঙুল কেটে দিয়ে, নৃশংস অত্যাচার করে অর্ধমৃত করে রাখা হয় তিলে তিলে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জীবনীশক্তির জোরে আবার মাতৃভাষার সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেশাথকে বলে ওঠেন — “এতোদিনে আমার ভুল ভেঙেছে দেশাথ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে শুধু রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের বড়াই করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাথ।”^৭

আলোচ্য উপন্যাসে প্রেমের পুজারী শবরীর পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী চলে সেই উদাহরণও মেলা। পুরুষ ও নারীর কাজে ভেদাভেদ না করে রামকীর অবর্তমানে তার স্ত্রী দেবকী একাই মদ চোলাই করা, খন্দের আপ্যায়ন, কড়ির হিসেব রাখা ইত্যাদি সব কাজ একাই অবলীলায় করে ফেলে। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নের যে বাস্তবতা আমরা অবলোকন করি, তার প্রতিফলন চর্যাপদে বহুপূর্বেই নারীর জীবনচর্চা প্রতিফলিত হয়েছে সময়, সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী। অন্যদিকে সমাজ বহির্ভূত এক ডোম্বী রমনীর চরম সাহসিকতার পরিচয় পাই ডোম্বী চরিত্রটির রূপায়নে। দেবল ভদ্রের অত্যাচারে ডোম্বীর লাশ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তার অপরাধ — “ওই যে মেয়ে লোকটা নৌকা বাইতো। সাহস কত বামুনের গায়ে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলেছে।”^৮ এই ঘটনা কাহ্নর পায়ের তলার মাটি শব্দ করেছে। প্রাণ বাঁচাতে ওরা সবাই দূরে টিলার উপর আশ্রয় নিয়েছে। তখন বাতাসে কিসের গন্ধ ভেসে আসে। দেশাথ কাকে জিজ্ঞাসা করে এটা কিসের গন্ধ? কাহ্নর নির্লিপ্ত উত্তর — “কেউ হয়তো আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিল দেশাথ। জানতেও পারেনি। তাই আগুনে ছাই হয়ে গেছে।”^৯ তখন কারোর আর সত্যিটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর তখনই চামড়া পোড়া গন্ধ বাতাসের প্রবল ঝাপটায় ওদের সবার নাকে, মুখে গলগলিয়ে ঢোকে। আর তখন ভুসুকু প্রাণভরে সেই বাতাস নাকে টেনে নিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে আর বলেন — “কাহ্নিলা রে আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।”^{১০}

যুগে যুগে এভাবেই তো নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষ ফুঁসতে থাকে আর তাদের সহনশীলতার বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন এই ভাবেই তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ভাষা খুঁজে পায়। এভাবে মাতৃভাষাকে রাজদরবারের ভাষা করার দাবীতে হাজার বছরের পুরনো কাহ্ন পার স্বপ্নের ভূখণ্ড আর বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ড মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ‘সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ : প্রাগাধুনিক বনাম আধুনিক’, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১৭
২. ‘প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব’, তপোধীর ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৫-১০৬
৩. ‘সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ : প্রাগাধুনিক বনাম আধুনিক’, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১০৩
৪. সম্পাদক: মুসা, এ, আই, এম, পাতাপ্রকাশ, বাংলাদেশ, <https://pataprakash.com>
৫. ‘নীল ময়ূরের যৌবন, সেলিনা হোসেন, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫
৬. ওই, পৃ. ১২৭
৭. ওই, পৃ. ১৪২
৮. ওই, পৃ. ১৪০
৯. ওই, পৃ. ১৪৪
১০. ওই, পৃ. ১৪৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ‘জাক দেরিদা : তাঁর বিনির্মাণ’, তপোধীর ভট্টাচার্য, জানুআরি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭
২. ‘বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি’, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৮

পত্রিকা:

১. ‘নতুন মাত্রা’ আল মুজাহিদী (সম্পাদিত), অনন্য পৃথ্বীরাজ, ‘সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ’ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭
২. ‘বহুমাত্রিক কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন’ কামরুল ইসলাম (সম্পাদিত), ‘সেলিনা হোসেনের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পত্রিকা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশিত, জুন ২০১৭

অন্তর্জাল:

১. সেলিনা হোসেন পরিপ্রেক্ষিত কথাসাহিত্য, শাহনাজ পারভীন, কালি ও কলম, জানুআরি ২০১৮
<https://www.kaliokalam.com>
২. পাতাপ্রকাশ, সম্পাদক: এ, আই, এম, মুসা, বাংলাদেশ <https://pataprokash.com>

লেখক পরিচিতি: শর্মিষ্ঠা আচার্য, সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।